প্রথম আলো

তারিখ 2 1 FEB 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষাঙ্গনে দখলদারি ■ ফারুক ওয়াসিফ

একেকটা ক্যাম্পাস কি একেকটা উপরাষ্ট্র?

ক্ষুধার্ত দানব খাদ্য না পেলে কী করে? রূপকথা বলে, তখন সে নিজেরই মাংস খাওয়া শুরু করে। সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মারামারি-রক্তপাত দেখে এ ছাড়া আর কী বলা যায়? একদিকে প্রধানমন্ত্রীর তিরস্কার-ধুনিয়ারি, অন্যদিকে মাস্তান বাহাদুরদের সশস্ত্র বাহাদুরি সমানে চলছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক, এক মাসের মধ্যে দুইবার ছাত্রলীগের দুই উপদলের মধ্যে ক্যাম্পাসের দখল, হলের দখল—এমনকি টেন্ডারের চাঁদার দখল নিয়ে লড়াই হয়েছে। দুইবারই নির্দলীয় শিক্ষার্থীদের হলের ভেতর, কক্ষের ভেতর, কিংবা ছাদের ওপর গিয়ে করে নির্যাতন করা হয়েছে। হল তো নিষ্প্রাণ কাঠামো, তাই নিরীহ ছাত্রদের পিটিয়েই ক্ষান্তরা তাদের ক্ষমতার প্রমাণ রাখে। ২০০৫ সালের ১৮ এপ্রিল এভাবেই নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ ক্যাম্পাসেই ছাত্রদলের ক্যাডারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, পুলিশ ও সশস্ত্র ক্যাডারের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ছবি। এবারও তখনকার মতো প্রক্টরের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে অস্ত্রের মুখে খেদিয়ে হল দখল করা হয়। কিন্তু ঘটনার আরও বাকি আছে এবং তা ততটা প্রকাশ্য নয়। সেদিকে নজরপাত করাই আজকের উদ্দেশ্য।

প্রথমত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতার শেকড় যে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে—এ খবর আমরা জানি। বড় রাজনৈতিক দল কিংবা তাদের আশ্রিত গডফাদারদের ইস্কন ছাড়া যে এসব চলতে পারে না, তা সাদা চোখেই বোঝা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষকদের বিভিন্ন দল-উপদলের ভূমিকা অত ফকফকা কি? রাতে সূর্য দেখা যায় না বলেই তো আর সূর্যের অস্তিত্ব নাই হয়ে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষকের ভূমিকা তেমনি সূর্যসমান। যদিও বেশির ভাগ সময়ই তা গোপনীয়তার পর্দায় ঢাকা থাকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতির তিনটি ধারা বা গ্রুপ বিদ্যমান: ১. বিএনপি-জামায়াতপন্থী, ২. বিএনপি-আওয়ামী লীগের মিলিত 'সমমনা গ্রুপ' এবং ৩. খাঁটি আওয়ামীপন্থী গ্রুপ। এর বাইরে রয়েছে নির্দিষ্ট গ্রুপহীন একদল শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও শিক্ষক সমিতির নির্বাচন, উপাচার্য নির্বাচন, প্রশাসন ও ক্যাম্পাস পরিচালনাসহ বহু বিচিত্র প্রয়োজনে এঁরা তাঁদের আনুগত্য বিক্রি করেন। দাম বাড়ানোর জন্য নানা কূটচাল ও ফন্দিবাজির সঙ্গেও এঁরা জড়িত হন। এ গ্রুপগুলো স্থায়ী হয় না। স্বার্থের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হন বটে। আবার স্বার্থের প্রয়োজনেই সেই মৌসুমি সমঝোতা ভেঙে যায়। শুরু হয় নতুন স্বার্থভিত্তিক নতুন গোষ্ঠীর রাজনীতি। জনপ্রিয় বচনে এর নাম 'ডিগবাজি'। যা-ই হোক, গ্রুপগুলোর গঠন দেখলেই বোঝা যায়, আসলে রাজনীতি মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে ক্ষমতার হিস্যা ও প্রশাসনিক শীর্ষ পদ। আর কে না জানে, ক্ষমতা বা পদ থাকলে বাকি সব বিষয় আপনাতেই হাতে এসে যায়। খবরে প্রকাশ, ঘাস কাটা কমিটিতে থাকার জন্যও নাকি গ্রুপিং-দলিং হয়। সত্যিই কলিকাল!

জার্মান দার্শনিক হেগেল বলতেন, যেমন জাতি তেমন নেতা। আবার উল্টোটাও সত্য। আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাল-হকিকত দেখে মনে হয়, হেগেল বোধকরি মিথ্যা বলেননি। শিক্ষক রাজনীতি যেমন, ছাত্ররাজনীতিও তেমনি; আবার ছাত্ররাজনীতি যেমন, শিক্ষক রাজনীতিও তেমনি। উভয়ের যোগটি স্পষ্ট হয় যখন দেখি, জাবির ওই তিনটি ধারার শিক্ষক রাজনীতির আদলে ছাত্ররাজনীতিতেও একই রকম তিনটি ধারা গজিয়ে যায়। সেখানে রয়েছে একটি ছাত্রশিবির-সমর্থিত খাঁটি ছাত্রদল, একটি খাঁটি ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল-সমর্থিত ছাত্রলীগ। নতুন সরকারের সূর্যোদয়ের দিন থেকে ছাত্রদলের ক্যাডাররা আর স্বনামে নেই। ঠিক যেমন অতীতে ক্ষমতার রোশনাই ফুরানোর পর ছাত্রলীগও বেমালুম লুপ্ত হয়েছিল। তাজব রয়েছে, বিএনপি সরকারের বিদায়ের পর ছাত্রদলের কনিষ্ঠ কর্মীরা তাদের হাতে থাকা অস্ত্র ছাত্রলীগকে দেওয়ার বিনিময়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগে যোগদানের সুযোগ পায়। এরই ওপর নাম হয় ছাত্রদল-সমর্থিত ছাত্রলীগ।

এরকম বেমিল ঐক্য আগেও হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে ধর্ষণের বিচারের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা নির্দলীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে আন্দোলনে নামলে তার বিরুদ্ধেও ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রদলের একাংশের আঁতাত ও আন্দোলন দমনের ঐক্য হয়। কেননা সে সময় উভয় দলের ক্যাডারদের বিরুদ্ধেই যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল। সম্প্রতি নাটাতত্ত্ব বিভাগের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের সময়ও দেখা যায়, তিনি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের বিরোধী শিক্ষকদের কোনো একটি গ্রুপের সমর্থন পাচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য কিছু ছাত্রকে পেটায় ওই শিক্ষকের মতাদর্শের বিপক্ষের ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। এ রকম ঘটনা অজস্র। সর্বশেষ ১৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসনের সরাসরি মদদে এক গ্রুপকে তাড়িয়ে আরেক গ্রুপের রাজত্বের পুনর্বাসনও দেখা হলো। পুলিশ, প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিরা (এঁরাও শিক্ষক) এবং হল দখলে আওয়ামী সশস্ত্র ক্যাডাররা একত্রে ১০০ বর্গফুটের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চালিয়ে গেছে। আমেরিকা-রাশিয়া না পারুক, কংগ্রেস-লীগ না পারুক, স্বার্থের জন্য এরা দিব্যি প্রতিপক্ষের সঙ্গেও সহাবস্থান করতে পারে।

সুতরাং শিক্ষাঙ্গনে শান্তি নষ্টের জন্য কেবল ছাত্র-সন্ত্রাসীদের দুষলে চলবে না, কেবল কেন্দ্রীয় নেতাদের উদাসীনতাকে দায়ী করলেই দায়িত্ব ফুরায় না। বরং দল-ক্যাডার-শিক্ষক—এ ত্রিভুজ ঐক্যের পুরোটাকেই মনোযোগে আনতে হবে। এ ত্রিভুজের ভূমির বাহু হচ্ছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা কমিটির ভেতরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোনো নেতা বা নেত্রী। ক্ষমতার এ ভূমিটিই মূল। এর ওপর একদিকে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাডার-নেতার ক্ষমতার বাহু, অন্যদিক থেকে হেলান দিয়ে মিলেছে শিক্ষক নেতার ক্ষমতার বাহু। এ ত্রিভুজের মধ্যে বহুভাবে বন্দী হয়ে আছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষকেরা। একজন সাধারণ ছাত্র বা ছাত্রী, যে হয়তো কেবল পড়ার মধ্যেই থাকতে চায় অথবা যে হয়তো কোনো প্রগতিশীল ছাত্র বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী, তার জন্য সমস্যানে শিক্ষাজীবন শেষ করা পুলসিরাত পার হওয়ার সমান কঠিন। তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিছিলে যেতে হবে, তার জন্য বরাদ্দ সিটটি পেতে তেল-তোয়াজ করতে হবে কিংবা যখন-তখন সেই সিটটি ছেড়ে দিতে হবে। নির্দলীয় বা প্রগতিশীল শিক্ষকদের অবস্থাও এর থেকে বেশি সুখকর নয়। সেরা যোগ্যতা প্রমাণ করেও অনেকে শিক্ষক হতে পারেন না। তিনিই পারেন, যাঁর যোগ্যতা যা-ই হোক লবি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। এভাবে শিক্ষক হওয়ার জেরে তাঁকে কোনো না কোনো গ্রুপকে সমর্থন দিতে হবে। নইলে আবাসনসুবিধা পাবেন না, যথাসময়ে প্রমোশন হবে না ইত্যাদি। তাই প্রশ্ন জাগে, এ নিরীহ কিন্তু মেধাবী শিক্ষকদের রক্ষায় কী করা হবে? কী করা হবে শিক্ষক রাজনীতির ভেতরকার অসাধু দলাদলির ব্যাপারে?

বিষয়টা অনেকটা সমুদ্রের গভীরের স্রোতের মতো। সমুদ্রের ওপরের জল যখন খুব শান্ত, তখনো কিন্তু তলায় গভীর আলোড়ন চলতে পারে। আজকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সন্ত্রাসী আলোড়ন দেখা যাচ্ছে, তা হয়তো তলায় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ, উপাচার্য পদ নিয়ে গোষ্ঠীগত টানাটানিরই প্রতিফলন, ক্ষমতার কুর্সিরই প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ায় না গিয়ে আমাদের তাই তাকাতে হবে ক্রিয়ার দিকে, ক্ষমতার উৎসের দিকে। পরিবর্তন যদি ঘটাতে হয়, ঘটাতে হবে সেখানে। তা না হলে ছাত্ররাজনীতিকে বন্দির পাঠা করা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

তবে আও পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত তিনজনের প্যানেলের যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার যে ক্ষমতা আচার্যের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, তা সংশোধন করতে হবে। তার মধ্য দিয়েই সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব ফেলার সুযোগ থেকে যায়। এ রকম অবস্থায় ওই তিনজনের মধ্যে কে কার থেকে বেশি অনুগত, ক্যাম্পাসের ওপর কার বেশি নিয়ন্ত্রণ, তা প্রমাণের প্রতিযোগিতা চলে। তার জের ধরেই উদ্ভূত হয়ে ওঠে শিক্ষাঙ্গন। উপাচার্য নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ভোটেই হতে হবে।

দখলদারির এ চিত্র কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নয়, পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে সর্বত্রই দেখা যায়। সবখানেই ছোট-বড় নানা ক্ষমতার চক্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে আছে— যেন রাষ্ট্রের ভেতর একেকটি উপরাষ্ট্র। সরকারি দল বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তারা নির্দিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠানের ওপর দখলদারির অলিখিত ইজারা নেয়। সেটাই তাদের উপরাষ্ট্র। তার ভেতরের সবকিছুর ওপরই তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। বিনিময়ে তারা সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানদের চাহিদা মেটায়, সমর্থন দেয়। ক্ষমতার এ বিস্ফোরণ কেবল রাজনীতিকে আশ্রয় করেই ফুলে-ফেঁপে ওঠেনি। রাজনীতির বাইরে থেকেও আমরা এরূপ দখলদারদের উত্থান দেখেছি। জরুরি অবস্থায় যখন রাজনীতি নিষিদ্ধ, তখনো বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতি কিংবা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে রাজনীতি চলেছে। তাই যতক্ষণ না রাষ্ট্র সত্যিকার রাষ্ট্র হয়ে উঠছে, অর্থাৎ সবখানে অধিকারবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যাচ্ছে ততক্ষণ ছাত্র বা শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে কিছু হবে না। জানতে হবে উপরাষ্ট্র ধরনের ক্ষমতার যৌটগুলো। সমাজে যতক্ষণ দুর্বৃত্ত ক্ষমতা থাকে, থাকে দুর্নীতি ও দখলের চর্চা, ততক্ষণ পরিবর্তনের আশা কুহক জাগাবে, হাতে ধরা দেবে না।

জরুরি অবস্থার সময় আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংস্কার করে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের লেজুড়বৃত্তির সুযোগ বন্ধ করা হয়। কিন্তু তাতে কি তারা স্বাধীন ভূমিকা পালন করছে? তাই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করলেও লেজুড়বৃত্তি ও সন্ত্রাসী দাপট বন্ধ হবে না। আঞ্চলিক সমিতি কিংবা বৃক্ষপ্রেমিক সংঘের নামে তাদের দাপট যে চলবে না, তার নিশ্চয়তা কী? পাশাপাশি এটা নীতিরও প্রশ্ন। সংগঠন করা, মতপ্রকাশ করা সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার। আও সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কৌশলের নামে এ নীতিকে আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। কেবল ইতিহাসের দোহাই নয়, এ বর্তমানেও নির্যাতন, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেধাবী ও প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের ধারা বিদ্যমান। এরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে—এমনকি সন্ত্রাস ও দখলদারির বিরুদ্ধে সব সময়ই সোচ্চার। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের নামে আমরা কি এ ইতিবাচক ধারাকেও নিষিদ্ধ করে ক্যাম্পাসগুলোকে অরাজনৈতিক পরিচয়ের রাজনৈতিক ক্যাডারদের অভয়ারণ্য বানাতে দেব? ভুলে গেলে চলবে না, পঞ্চাশের থেকে আশির দশকের শেষ অবধি যে ছাত্র আন্দোলন আমরা দেখি, তা কিন্তু স্বাধীন ধারার। লেজুড়বৃত্তি তারা মানতো না। কী বাঘাঘ আর কী উনসত্তর, আর কী এরশাদশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন; প্রতিবারই দেখা গেছে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে এগিয়ে গেছে। নেতাদের করা যদি তারা সবসময় শুনতো, তাহলে আমাদের অনেক গৌরবই হাতছাড়া হওয়ার ভয় ছিল।

প্রকৃতি ও সমাজে কোনো কিছুই শূন্য থাকে না। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের পরে শিক্ষাঙ্গনেও ক্ষমতার দাপটশূন্য করা যাবে না। দল-লীগ-শিবিরের শূন্যতা সেখানে অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবে। সেটা যাতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবকদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা দিয়ে পূরণ হয়, সেই বন্দোবস্ত আগে করা চাই।

সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লেজুড়বৃত্তি আজ সমুদ্রসমান হয়ে গেছে। কিন্তু সমুদ্র কি সেচা যায়? নদনদীর বিশুদ্ধ পানি যত বেশি সেই দূষিত সমুদ্রে এসে পড়বে, ততই সমুদ্রও আপন নিয়মে দূষণমুক্ত হবে। সেই নদী হলো জনগণ। হুকুমের বলে সেই নদীকে বইয়ে দেওয়া অসম্ভব। তার জন্য জনগণ তথা ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের যে সংখ্যাগরিষ্ঠটি অংশটি আজ ক্ষমতার চাপে-তাপে নির্জীব, তাদের জন্য পথ করে দিতে হবে। তাদের শক্তিশালী করতে হবে। দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য হলেও সেটাই এ দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার পথ।

আমরা পথ না পাই, পথে নামার নামে নতুন করে পথ হারাতে চাই না।

● ফারুক ওয়াসিফ: সাংবাদিক।
farukwasif@yahoo.com